ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ঢাকা শহরে বেসরকারি আবাসন খাতে ভূমি উন্নয়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

সার-সংক্ষেপ

২৫ নভেম্বর ২০২৬

ঢাকা শহরে বেসরকারি আবাসন খাতে ভূমি উন্নয়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি*
মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, *পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা তত্ত্বাবধান

শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো*

গবেষণা পরিচালনা

ড. অতনু দাস, *রিসার্চ ফেলো (প্রাক্তন)*

গবেষণা সহকারী

নওশীন আনজুম, খাইরুল হাসান, হাসান মাহমুদ কামরান, সোপান চাকমা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণার তথ্যদাতা ব্যক্তিবর্গের প্রতি, যাঁরা তাঁদের পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ মতামতের মাধ্যমে এই গবেষণাকে অধিকতর সমৃদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য করেছেন। তদুপরি, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অংশীজন–বিশেষত সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক ও সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, গণমাধ্যমকর্মী, বেসরকারি আবাসন খাতের প্রতিনিধিবৃন্দ, পেশাজীবী সমাজ এবং খাতসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ–যাঁরা তাঁদের মূল্যবান তথ্য-উপাত্ত, বিশ্লেষণধর্মী মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে এই গবেষণার গুণগত উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে নিষ্ঠার সাথে সহযোগিতা প্রদানের জন্য গবেষণা সহকারী নওশীন আনজুম, খাইরুল হাসান, হাসান মাহমুদ কামরান এবং সোপান চাকমার প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। একইসঙ্গে গবেষণার তত্ত্বাবধান, প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও প্রাঞ্জল সম্পাদনার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখার জন্য সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম. আকরাম, এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামানের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। গবেষণা কার্যক্রমে সার্বিক দিকনির্দেশনা, নীতিগত প্রজ্ঞা ও গঠনমূলক মতামত প্রদানপূর্বক প্রতিবেদনটির মানোন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা (নির্বাহী ব্যবস্থাপনা) অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং নির্বাহী ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পরিশেষে, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মী, যাঁরা প্রতিবেদনটির উপস্থাপনা, পরিমার্জন ও উৎকর্ষ সাধনে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেছেন, তাঁদের প্রতিও জানাই অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

ঢাকা শহরে বেসরকারি আবাসন খাতে ভূমি উন্নয়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

সার-সংক্ষেপ

১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের সংবিধান [অনুচ্ছেদ ১৫(ক)], জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা [অনুচ্ছেদ ২৫(১)] এবং 'জাতীয় গৃহায়ন নীতি, ২০১৬'-এর আলোকে নাগরিকদের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত আবাসন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় থেকে সরকার বিভিন্ন আবাসন প্রকল্প ও পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করলেও সীমিত সরকারি বিনিয়োগ, জমির স্বল্পতা, দ্রুত নগরায়ণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ঢাকাকেন্দ্রিক অভিবাসনের কারণে আবাসন সংকট ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে আবাসন খাতে চাহিদা ও যোগানের বড় ঘাটতি পূরণে বেসরকারি আবাসন প্রতিষ্ঠানগুলো অপরিহার্য ভূমিকা পালন করছে।

১৯৬৫ সালে ইস্টার্ন হাউজিং লিমিটেড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশে বেসরকারি আবাসন খাতের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে আবাসন সরবরাহের পাশাপাশি বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, এবং নির্মাণসামগ্রী ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের সম্প্রসারণে এ খাতের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তবে অপরিকল্পিত নগরায়ণ, প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়হীনতা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দুর্বলতা এবং অতিরিক্ত বাণিজ্যিক স্বার্থের কারণে নগরের পরিবেশ ও বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একইসঙ্গে বেসরকারি আবাসন প্রকল্পে প্রতারণা, আইন লঙ্ঘন, রাজনৈতিক প্রভাব, জমি-সংক্রান্ত বিরোধ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মতো অভিযোগ এ খাতের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

টিআইবির বিভিন্ন গবেষণায় পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালাসহ বিভিন্ন বিধিবিধানের লঙ্ঘন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, এবং সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বা ঘাটতির কিছু বিষয় উঠে এসেছে। এছাড়া বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা ও প্রতিবেদনে প্রতারণা, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, ক্ষমতার আধিপত্য ও অপব্যবহার, আইন লঙ্ঘন এবং জমি সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এসব গবেষণায় আবাসন খাতে সুশাসনের বিভিন্ন ঘাটতি চিহ্নিত হলেও এ খাতে গভীর ও বিস্তারিত গবেষণা অপ্রতুল। বর্তমান গবেষণা এই খাতে সুশাসন সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ঘাটতি পূরণ করতে সহায়ক হবে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ঢাকা শহরে বেসরকারি আবাসন খাতে ভূমি উন্নয়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. বেসরকারি আবাসন খাতে ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করা;
২. এ খাতে নীতি নির্ধারণ, বাস্তবায়ন, নিয়ন্ত্রণ, তদারকি ও জবাবদিহি প্রক্রিয়ায় জড়িত অংশীজনদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা;
৩. বেসরকারি আবাসন খাতে বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন এবং কারণ চিহ্নিত করা; এবং
৪. এ খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

৩. গবেষণার পরিধি

বেসরকারি ভূমি উন্নয়ন কোম্পানির সংখ্যা এবং তাদের কার্যক্রমের ঘনত্ব ও ভৌগোলিক ব্যাপকতা বিবেচনায় শুধু ঢাকা শহরে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। গবেষণাটি বেসরকারি আবাসন খাতে ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রমের ওপর পরিচালিত হয়েছে। এই গবেষণায় শুধু ঢাকা শহরে ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনাকারী বেসরকারি রিয়েল এস্টেট কোম্পানি অন্তর্ভুক্ত। মূলত বেসরকারি আবাসন খাতে ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চারটি প্রধান অংশীজন এবং তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া এ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত – রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, প্লট ক্রেতা, ভূমির পূর্বতন মালিক/ভূমি বিক্রেতা এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহ।

৪. গবেষণাপদ্ধতি

এ গবেষণায় গুণবাচক গবেষণাপদ্ধতি (Qualitative Method) এবং ব্যাখ্যামূলক অনুভূতিমূলক গবেষণা নকশা (Interpretative Phenomenological Research Design) অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার তথ্য মূলত দুটি উৎস থেকে সংগৃহীত – মাধ্যমিক উৎস হিসেবে পদ্ধতিগত নথি পর্যালোচনা ('ডেস্ক রিভিউ') এবং প্রাথমিক উৎস হিসেবে মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মূলত দুটি গুণবাচক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, তথ্যদাতার সংখ্যা নির্ধারণে তথ্যের পুনরাবৃত্তি (Data Saturation) নীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

- **নিবিড় সাক্ষাৎকার:** রিয়েল এস্টেট কোম্পানির প্রতিনিধি, প্লট ক্রেতা এবং মূল ভূমি মালিক বা বিক্রেতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যদাতা নির্বাচনে মিশ্র উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (Mixed Purposive Sampling) পদ্ধতির অন্তর্গত সর্বাধিক বৈচিত্র্যমূলক নমুনায়ন (Maximum Variation Sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

- **মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার:** এ খাতের বিভিন্ন অংশীজন যেমন রিয়েল এস্টেট কোম্পানির প্রতিনিধি, সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থা (রাজউক, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, ডিটিসিএ), রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সংগঠন (রিহ্যাব, বিএলডিএ), নগর স্থানীয় সরকার ও জনসেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন), এবং ইউটিলিটি সেবা সংস্থার (ওয়াসা, ডিপিডিসি, ডেসকো) প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ (প্রকৌশলী, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষক) এবং মাধ্যমভিত্তিক বিশ্লেষক বা সংবাদমাধ্যম কর্মীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। তথ্যদাতা নির্বাচনে মিশ্র উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (Mixed Purposive Sampling) পদ্ধতির অন্তর্গত বিশেষজ্ঞ নমুনায়ন (Expert Sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণার পুরো প্রক্রিয়া ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৬ সালের জুলাই মাসের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

৫. বিশ্লেষণ কাঠামো

এ গবেষণার প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, ব্যবহার এবং পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুশাসনের ছয়টি নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে (সারণি ১)।

সরাণি ১: বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসনের নির্দেশক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়
আইনের শাসন	বিদ্যমান নীতি ও আইনি কাঠামো পর্যালোচনা; প্রতিপালনের ঘাটতি/সীমাবদ্ধতা/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
সক্ষমতা ও কার্যকরতা	সংশ্লিষ্ট অংশীজন/প্রতিষ্ঠানের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া; নীতি বাস্তবায়ন; তদারকি প্রক্রিয়া; মানবসম্পদ; কর্ম সম্পাদন ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও সক্ষমতা; বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা; সাশ্রয়ী আবাসন
স্বচ্ছতা	নীতিমালা প্রণয়ন/নির্ধারণ প্রক্রিয়া; তথ্য প্রকাশ, প্রচার ও তথ্যে অভিগম্যতা; ওয়েবসাইট ও হালনাগাদ তথ্য ব্যবস্থাপনা; প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন; মূল্য নির্ধারণ; আবাসন ব্যবসা পরিচালনা
অংশগ্রহণ ও সমন্বয়	অংশীজনদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও অংশগ্রহণ; ভূমি/প্লট ক্রয়-বিক্রয় এবং মূল্য নির্ধারণ; নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা
জবাবদিহি	অভিযোগ ব্যবস্থাপনা/প্রতিকার ব্যবস্থা; সাড়াদান ও অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া; তদারকি ও নিরীক্ষা
অনিয়ম ও দুর্নীতি	নীতি নির্ধারণ, প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন, ভূমি উন্নয়ন এবং প্লট হস্তান্তরে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, কারণ ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ; ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নিরূপণ ও বিতরণ; ছাড়পত্র ও ইউটিলিটি সেবা প্রাপ্তিতে অনিয়ম ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেন

৬. বেসরকারি আবাসন খাতে অংশীজন কাঠামো বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের বেসরকারি আবাসন ও ভূমি উন্নয়ন খাত একটি বহুমাত্রিক অংশীজন কাঠামোর পারস্পরিক সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যারা এ খাতে নীতিনির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি, ভূমি সরবরাহ, আবাসন উন্নয়ন, বাজার ব্যবস্থাপনা, নাগরিক সেবা এবং সুশাসন নিশ্চিতকরণে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে। খাতটির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, দায়িত্ব বণ্টন ও কার্যগত সম্পর্ক অনুধাবনের জন্য অংশীজনদের সাধারণত ১২টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যার মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, নীতিনির্ধারণ, অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ/ বোর্ড, ইউটিলিটি সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, ভূমি ও প্লট সরবরাহকারী, গ্রাহক, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী সংগঠন, বাজার মধ্যস্থতাকারী ও তথ্য প্রচারকারী, পেশাগত ও প্রযুক্তি সহায়তাকারী, সংযুক্ত শিল্প ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সামাজিক ও প্রভাবশালী, এবং নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠান।

৭. গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

৭.১ আইনি কাঠামো পর্যালোচনা

রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০: এ আইনের ধারা ৫(৩) অনুযায়ী ডেভেলপারদের নিবন্ধনে রিহ্যাব বা বিএলডিএর সদস্যপদ ঐচ্ছিক হলেও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রে তা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, অন্যদিকে রিহ্যাবের সদস্য হতে অন্তত একটি প্রকল্পের কাজ শুরুর শর্ত থাকায় সরকারি নিবন্ধন, অনুমোদন ও সদস্যপদের ক্রম নিয়ে প্রশাসনিক ও বাস্তবিক বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এছাড়া ধারা ৫(৭)-এ নিবন্ধন নবায়নের সময় সংশ্লিষ্ট কোম্পানির পূর্ববর্তী অপরাধ, প্রতারণা, আইন লঙ্ঘন ও চুক্তি ভঙ্গের রেকর্ড পর্যালোচনার বাধ্যবাধকতা না থাকায় অসাধু প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসায়িক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সুযোগ রয়েছে। ক্রেতার সুরক্ষার ক্ষেত্রে ধারা ৬(৪)-এ মালিকানা ও অনুমোদনের দলিলপত্র কেবল "প্রদর্শনের" কথা বলা হলেও সত্যায়িত অনুলিপি সরবরাহের বাধ্যবাধকতা না থাকায় সাধারণ ক্রেতারা জমির প্রকৃত সত্যতা ও আইনি ঝুঁকি যাচাই করতে ব্যর্থ হন। ধারা ৮(১)-এ "প্রসপেক্টাস অথবা বরাদ্দপত্র" শব্দবন্ধ ব্যবহারের সুবাদে ডেভেলপাররা বিজ্ঞাপনে লোভনীয় সুবিধা দেখালেও চূড়ান্ত চুক্তিতে তা বাদ দেওয়ার সুযোগ পায়। এছাড়া ধারা ৮(৩)-এ বরাদ্দকৃত প্লট বা ফ্ল্যাট পরিবর্তনের সময় ক্রেতার "লিখিত" সম্মতি নেওয়ার স্পষ্ট বিধান না থাকায় ডেভেলপাররা ক্রেতার ওপর একতরফা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ পায়।

বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১২ ও ২০১৫): বিধি ৭(১) অনুযায়ী, আবাসন প্রকল্পের অনুমোদনের জন্য ডেভেলপারের ন্যূনতম ৭৫% জমি (৭০% নিরঙ্কুশ মালিকানা ও চুক্তিভিত্তিক জমিসহ) থাকার বাধ্যবাধকতা থাকলেও অবিক্রিত অবশিষ্ট ২৫% জমির মালিকেরা চরম ঝুঁকিতে পড়েন এবং ডেভেলপারের অন্যায্য চাপ ও ক্ষমতা প্রয়োগের ঝুঁকিতে থাকেন। পাশাপাশি বিধি ৭(২) ও ৭(৩)-এ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের কথা বলা হলেও এতে স্পষ্টতার অভাব রয়েছে – জমি হারিয়ে প্রধান জীবিকা (যেমন কৃষি বা ক্ষুদ্র ব্যবসা) বন্ধ হলেও অর্থনৈতিক ক্ষতির আইনি ক্ষতিপূরণের বাধ্যবাধকতা নেই, পুনর্বাসন প্লট প্রদান বা নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত ৫০% মূল্য পরিশোধের সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুপস্থিত, এবং পুনর্বাসন প্লটের অবস্থান নির্দেশ না করায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুরোপুরি ডেভেলপারের ওপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়া বিধি ৯(৪)-এ প্লট ক্রেতার স্বার্থরক্ষার কথা থাকলেও শর্তের কোনো প্রমিত বা সার্বজনীন মানদণ্ড না থাকায় ডেভেলপাররা একতরফা ও অসম শর্ত যুক্ত করে ক্রেতার অধিকার ক্ষুণ্ন করার সুযোগ পান। অন্যদিকে বিধি ১০(৬)(ঙ)-তে খেলার মাঠ ও কবরস্থানের নিয়ম থাকলেও প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু/ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা বা অতিরিক্ত জনসংখ্যার নাগরিক সুবিধা নিশ্চিতের কোনো নির্দেশনা নেই। বিধি ১৪(১)(ঝ)-তে প্রকল্প অনুমোদনে কেবল প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (ইআইএ) দাখিলের বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে, যা একটি বৃহৎ আবাসিক প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের জন্য যথেষ্ট নয়।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০): এ আইনের ধারা ৫(১) অনুযায়ী কেবল "সরকার যদি সন্তুষ্ট হয়" – এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কোনো এলাকাকে 'পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা' (ইসিএ) ঘোষণা করার সুযোগ রয়েছে। তবে ইসিএ ঘোষণার পূর্বে পরিবেশগত ঝুঁকি বৈজ্ঞানিকভাবে শনাক্ত করার বাধ্যতামূলক আইনি ধাপ না থাকায় আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগেই রিয়েল এস্টেট ডেভেলপাররা দ্রুত জমি রূপান্তর ও ভূমি উন্নয়ন শেষ করে ফেলে, ফলে সংবেদনশীল পরিবেশগত অঞ্চল সংরক্ষণ বা তার পুনরুদ্ধার পরবর্তীতে অসম্ভব হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, ধারা ৬(ঙ)-তে "অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থে" প্রাকৃতিক জলাধার ভরাট বা শ্রেণি পরিবর্তনের সুযোগ রাখা হলেও এর কোনো স্পষ্ট আইনি সংজ্ঞা বা সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়নি, যার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন বা আবরণের আড়ালে বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের জন্য প্রাকৃতিক জলাশয় ভরাটের পথ সুগম হয়।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩: এ বিধিমালার বিধি ৫(১)(গ-ঘ) ও তফসিল-১ অনুযায়ী ভৌগোলিক সংবেদনশীলতা (যেমন জলাভূমি, বনভূমি বা পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা) বিবেচনা না করে কেবল আয়তনের ওপর ভিত্তি করে (২৫ একরের কম হলে 'কমলা' এবং বেশি হলে 'লাল') প্রকল্পের শ্রেণিবিভাগ করায় প্রকৃত পরিবেশগত ঝুঁকি উপেক্ষিত হয়। পাশাপাশি বিধি ১৬(৭)(গ)-তে "প্রযোজ্য ক্ষেত্রে" সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের কথা বলা হলেও এটি কোন সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য হবে তার স্পষ্ট মানদণ্ড না থাকায় সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন হয়ে যায়। এছাড়া বিধি ২৭(২)(ঘ) অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করতে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের ২৫% অর্থ আগাম জমার বিধান রাখা হয়েছে; তবে এই অর্থ ফেরতযোগ্য জামানত কি না, আপিল সফল হলে তা ফেরতের প্রক্রিয়া কী হবে বা মূল পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর আপিল বিধির সাথে এর সম্পর্ক কী – এসব বিষয় অস্পষ্ট থাকায় এটি ভুক্তভোগীর আপিলের অধিকারে বড় ধরনের আর্থিক ও আইনি বাধা সৃষ্টি করে।

৭.২ সক্ষমতা ও কার্যকরতা

রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সক্ষমতা ও কার্যকরতার ঘাটতি: অনেক রিয়েল এস্টেট কোম্পানি নামমাত্র নিবন্ধন ও প্রাথমিক নথিপত্রের ভিত্তিতে ব্যবসা শুরু করলেও তাদের প্রয়োজনীয়সংখ্যক কর্মী, নির্ধারিত পরিমাণ জমি ও অবকাঠামো থাকে না। রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর ব্যবস্থাপনা, অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণের ঘাটতি বিদ্যমান। আবাসন প্রকল্পগুলোতে ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খেলার মাঠ ও টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতে দীর্ঘমেয়াদি দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে। বৃহৎ ও প্রভাবশালী রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর একচেটিয়া আধিপত্য ও স্বেচ্ছাচারী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে রিহ্যাব ও বিএলডিএ ব্যর্থ; পাশাপাশি অনুমোদনহীন আবাসিক প্রকল্প ও রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে তাদের কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর ১৫০টির বেশি বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মূলত উচ্চ-আয়ের ও বিনিয়োগসক্ষম ক্রেতাদের লক্ষ্য করে "বিলাসবহুল জীবন" ও "লাভজনক বিনিয়োগ"-কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ফলে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের বিশাল জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতার উপযোগী সাশ্রয়ী আবাসন নির্মাণে তাদের ব্যবসায়িক মডেল ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং সামগ্রিক কার্যকরতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

নিয়ন্ত্রক, তদারকি ও বিরোধ নিষ্পত্তি-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্যকরতার ঘাটতি: বেসরকারি আবাসন খাতে রাজউক, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, পরিবেশ অধিদপ্তর, ইউটিলিটি সেবাদানকারী সংস্থা ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের জনবল, কারিগরি দক্ষতা, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান, যা প্রকল্পের অনুমোদন, ভূমি ব্যবহার ও পরিবেশগত অনিয়ম কার্যকর তদারকিতে বাধা সৃষ্টি করছে। প্রকল্প ও ভবন নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিদর্শনের সীমাবদ্ধতা, খাসজমি ও খালের তথ্য সংরক্ষণে দুর্বলতা এবং ইউটিলিটি সংস্থাগুলোর অপর্যাপ্ত তদারকি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করছে। পাশাপাশি, প্লটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিযোগিতাবিরোধী আচরণ মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যকরতার ঘাটতি রয়েছে। বিচারক-স্বল্পতা, মামলাজট ও দীর্ঘসূত্রতার কারণে ভূমি ও আবাসন-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি বিলম্বিত হচ্ছে, ফলে ক্রেতাদের অভিযোগের দ্রুত ও কার্যকর প্রতিকার এবং সামগ্রিকভাবে আইন প্রয়োগ, সেবা প্রদান ও প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে।

রিয়েল এস্টেট সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্যকরতার ঘাটতি: মাত্র ১০-১৫টি বৃহৎ কোম্পানির হাতে প্রায় ৯৫% বাজার কেন্দ্রীভূত থাকায় একচেটিয়া আধিপত্য তৈরি হয়েছে। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রভাব ও প্রতিনিধিত্ব বেশি থাকায় অনিয়ম, নকশা লঙ্ঘন ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিরুদ্ধে রিহ্যাব ও বিএলডিএর মতো সংগঠনগুলোর ভূমিকা দৃশ্যমান নয়। দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনার অভাব এবং অনিবন্ধিত কোম্পানিগুলোকে তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতাও এসব সংগঠনের কার্যকরতা সীমিত করছে।

পরিবেশগত ও ট্রাফিক প্রভাব মূল্যায়নে (ইআইএ ও টিআইএ) ঘাটতি: পেশাগত দক্ষতা, নির্ভরযোগ্য তথ্য এবং বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির ঘাটতি বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের ইআইএ ও টিআইএর গুণগত মান ও কার্যকরতা সীমিত করছে। অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত প্রতিবেদন তৈরির চাপ ও মুনাফার স্বার্থে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের পরিবর্তে কম অভিজ্ঞ জনবল দিয়ে এসব প্রতিবেদন তৈরি করানো হয়, ফলে প্রকৃত পরিবেশগত ও ট্রাফিক ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত হয় না। বিশেষত টিআইএর ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা, নির্ভরযোগ্য জাতীয় ডেটাবেইস এবং এলাকাভিত্তিক যানবাহনের সংখ্যা নির্ধারণের বিজ্ঞানসম্মত মানদণ্ড না থাকায় তা অনেকাংশে অনুমাননির্ভর। পাশাপাশি, তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোর আধুনিক নগর পরিকল্পনা সফটওয়্যার ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার অভাবে সমন্বিত ডিজিটাল মনিটরিং ও তথ্যভাণ্ডার গড়ে ওঠেনি, যা সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার কার্যকরতাকে সীমিত করে ফেলেছে।

৭.৩ স্বচ্ছতা

প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি: অনেক রিয়েল এস্টেট কোম্পানি বিপণন ও প্রচারণায় সক্রিয় হলেও তাদের প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ, নির্ভুল ও যাচাইযোগ্য তথ্য প্রকাশে ঘাটতি রয়েছে। কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপনে অতিরঞ্জিত বা বিভ্রান্তিকর তথ্য এবং অননুমোদিত প্রকল্পের প্রচারণা করা হয়, এবং প্রকল্পের অনুমোদন, লে-আউট, অবস্থান, সুযোগ-সুবিধা, মোট মূল্য, আনুষঙ্গিক ব্যয়, বুকিং বাতিল ও অর্থ ফেরতের শর্ত স্পষ্টভাবে জানানো হয় না। ভূমির মালিকানা ও দলিলপত্র, আর্থিক লেনদেন, মালিক-ডেভেলপারের অধিকার ও দায়িত্ব, আইনগত বিরোধ, প্রকল্পের অগ্রগতি এবং হস্তান্তরের সময় সম্পর্কেও পর্যাপ্ত ও হালনাগাদ তথ্যের অভাব রয়েছে। এছাড়া কোম্পানিগুলোর ওয়েবসাইট ও প্রচারমাধ্যমে এসব তথ্যের নিয়মিত আপডেট না থাকা, এবং অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যের ঘাটতি ক্রেতাদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং প্রতিকারপ্রাপ্তির সুযোগ সীমিত করে।

আর্থিক তথ্য প্রদানে ঘাটতি: প্লটের মূল্য, মোট পরিশোধযোগ্য অর্থ এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক দায় সম্পর্কে ক্রেতাদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদানে ঘাটতি রয়েছে। জমির মূল্য, উন্নয়ন ব্যয় ও সার্ভিস চার্জের পৃথক হিসাব প্রকাশ না করায় বিজ্ঞাপিত মূল্য ও প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয়। এছাড়া উন্নয়ন ফি, ইউটিলিটি সংযোগ, নিবন্ধন, হস্তান্তর ও নামজারিসহ বিভিন্ন অতিরিক্ত বা লুকানো খরচ (hidden charges), কিস্তির শর্ত, বিলম্বজনিত জরিমানা এবং বুকিং বা বরাদ্দ বাতিলের ক্ষেত্রে অর্থ কর্তন ও ফেরতের নিয়ম অনেক সময় আগেই স্পষ্ট করা হয় না। ফলে ক্রেতারা প্রকৃত ব্যয় ও আর্থিক ঝুঁকি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন না, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আবাসন খাতের আর্থিক স্বচ্ছতা ও প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ন করে।

প্লটের মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতার ঘাটতি: প্লটের মূল্য নির্ধারণে একক, প্রমিত ও সুস্পষ্ট মানদণ্ডের ঘাটতি বিদ্যমান। জমির ক্রয়মূল্য, উন্নয়ন ব্যয়, অবকাঠামোগত সুবিধা ও মুনাফার ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণের কথা বলা হলেও প্লটের অবস্থান, রাস্তার প্রস্থ, মুখ, অবস্থান (কর্নার বা লেক-সংলগ্ন) এবং কিস্তির মেয়াদভেদে মূল্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। তবে এসব উপাদানের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি ক্রেতাদের কাছে কতটা স্পষ্ট ও যাচাইযোগ্য, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এছাড়া সরকারি অর্থায়নে নির্মিত আশপাশের নগর অবকাঠামোর সুবিধা কাজে লাগিয়ে প্রকৃত উন্নয়ন ব্যয়ের তুলনায় বহুগুণ বেশি দামে প্লট বিক্রির প্রবণতাও দেখা যায়। কার্যকর সরকারি তদারকির অভাব, বাজারের চাহিদা এবং কোম্পানিগুলোর একতরফা সিদ্ধান্তের ওপর মূল্য নির্ধারণ নির্ভর করায় প্রক্রিয়াটি অস্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রণহীন।

পেশাজীবী সংগঠনসমূহের (রিহ্যাব ও বিএলডিএ) স্বচ্ছতার ঘাটতি: বেসরকারি আবাসন খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার পরিবর্তে রিহ্যাব ও বিএলডিএর মতো পেশাজীবী সংগঠনের বিরুদ্ধে সদস্য কোম্পানির অনিয়ম ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড উপেক্ষা বা অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা যায়। সরকারি খাসজমি দখল, জলাশয় ভরাট, বলপ্রয়োগ, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও ভূমিমালিকদের জমি বিক্রয়ে বাধ্য করার মতো গুরুতর অভিযোগে এসব সংগঠনের কার্যকর তদারকি ও প্রতিকারমূলক ভূমিকার ঘাটতি দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূমি দখল ও ভরাটের ঘটনাকে কারিগরি বা সীমানাগত জটিলতা হিসেবে উপস্থাপন কিংবা নিরপেক্ষ তদন্ত ছাড়াই অভিযোগকে জনশ্রুতি বলে উড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। ফলে সংগঠনগুলোর নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রশ্নবিদ্ধ হয় এবং খাতের সুশাসনের পরিবর্তে সদস্য কোম্পানির স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

৭.৪ সমন্বয় ও অংশগ্রহণ

বিভিন্ন সরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি: বেসরকারি আবাসন খাতের সুশাসন ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাজউক, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সিটি করপোরেশন, জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর ও ইউটিলিটি সংস্থাগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক বিচ্ছিন্নতা ও দায় এড়ানোর প্রবণতা প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটায়; বিশেষ করে ড্যাপ বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়, রাজউক ও ডেভেলপারদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা স্পষ্ট। জেলা প্রশাসন ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় না থাকায়

অননুমোদিত প্রকল্পের বিস্তার ঘটছে। পাশাপাশি, প্রাথমিক পর্যায়ে ইউটিলিটি সংস্থাগুলো সম্পৃক্ত না থাকায় গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানি সংযোগ ও সড়ক কাটার অনুমোদনে সময় ও ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ইআইএ ও টিআইএর জন্য সমন্বিত ডেটাবেইস না থাকায় নগরীর পরিবেশ ও অবকাঠামোর ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না।

ভূমি মালিক ও প্লট ক্রেতাদের অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধতা: বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের পরিকল্পনা, ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমি মালিক ও প্লট ক্রেতাদের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত। এসব সিদ্ধান্ত প্রধানত ডেভেলপারকেন্দ্রিক হওয়ায় ক্ষতিপূরণের ধরন (নগদ অর্থ অথবা পুনর্বাসন), জমি অধিগ্রহণের শর্ত ও ভূমির মূল্য নির্ধারণে ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের মতামত ও দর-কষাকষির পর্যাপ্ত সুযোগ থাকে না। বিশেষত, প্রাতিষ্ঠানিক দর-কষাকষির কাঠামোর অভাব এবং স্থানীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব ক্ষুদ্র ভূমি মালিকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতাকে আরও দুর্বল করে। অন্যদিকে, প্লট ক্রেতাদের অবহিত বা মতামত গ্রহণ না করেই অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের লে-আউট, রাস্তা ও উন্মুক্ত স্থানের পরিবর্তন করা হয়।

খাতসংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি: বেসরকারি আবাসন খাতে নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি ও প্রকৌশলীদের পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও অগ্রাধিকারের পার্থক্য সমন্বিত পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করছে। একদিকে নগর পরিকল্পনাবিদরা ড্যাপ অনুসরণ, জলাধার ও উন্মুক্ত স্থান সংরক্ষণ, জনঘনত্ব, পরিবহন এবং পরিবেশগত ভারসাম্যকে গুরুত্ব দেন, আর অন্যদিকে স্থপতি ও প্রকৌশলীরা ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার, প্লটের সংখ্যা বৃদ্ধি, নির্মাণ ব্যয় হ্রাস ও অর্থনৈতিক লাভকে বেশি প্রাধান্য দেন। ফলে প্রকল্পের ঘনত্ব, ভূমি ব্যবহার ও অবকাঠামো পরিকল্পনায় মতপার্থক্য তৈরি হয়। এছাড়া মহাপরিকল্পনা, আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের সময় সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী সংগঠনগুলোর মতামত গ্রহণের বাধ্যতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা না থাকায় সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাহত হয়।

রাজউক ও বেসরকারি পেশাজীবী সংগঠনসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা: রাজউক এবং রিহ্যাব-বিএলডিএর মধ্যে নীতিগত অংশগ্রহণ না থাকা, আইনি অস্পষ্টতা ও স্বার্থের সংঘাতের কারণে ব্যাপক সমন্বয়হীনতা বিদ্যমান। ড্যাপের 'ফ্লোর এরিয়া রেশিও' (এফএআর) ও ভবনের উচ্চতা পুনর্নির্ধারণে বেসরকারি খাতের মতামত না নেওয়ায় রিহ্যাবের বিরোধিতা ও আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছে। অননুমোদিত উচ্ছেদে রাজউকের পদক্ষেপে ডেভেলপারদের আদালতের স্থগিতাদেশ তদারকিকে বাধাগ্রস্ত করছে। পাশাপাশি রাজউকের নিজস্ব বাণিজ্যিক প্রকল্পের কারণে এর নিরপেক্ষ ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ।

৭.৫ অনিয়ম ও দুর্নীতি

৭.৫.১ বেসরকারি ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পে জমি নির্বাচন, সংগ্রহ ও অধিগ্রহণ

জমি নির্বাচন ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনিয়ম: বেসরকারি আবাসন প্রকল্পে জমি নির্বাচনে মৌখিক চুক্তি, পাওয়ার অব অ্যাটর্নির অপব্যবহার, খাসজমি ও জলাশয় দখল এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি জবরদখলের মতো অনিয়ম বিদ্যমান। জমি দখলে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো ছয় ধরনের কৌশল ব্যবহার করে – ভৌত পরিবর্তন, রাজনৈতিক প্রভাব, নথি জালিয়াতি, বলপ্রয়োগ, অর্থনৈতিক চাপ, এবং কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ। এর ফলে ভূমির মালিকরা বাধ্য হয়ে কম মূল্যে জমি বিক্রি করেন; প্রান্তিক ও নারী মালিকদের ঝুঁকি এক্ষেত্রে আরও বেশি। পাশাপাশি কৃষিজমি ও জলাশয় ধ্বংসের ফলে পরিবেশগত ভারসাম্য, বন্যা ব্যবস্থাপনা এবং কৃষি ও মৎস্যনির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকা মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ে।

জমির মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে অনিয়ম: বেসরকারি আবাসন খাতে ভূমির মালিকদের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধে নানা অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত বাজারমূল্য পরিশোধ না করে ভয়ভীতি, প্রলোভন বা চাপের মাধ্যমে নামমাত্র বা আংশিক অর্থ দিয়ে জমির মূল দলিল ও মালিকানা হস্তান্তর করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে অর্থ পরিশোধ না করে নানা অজুহাতে বিলম্ব করা এবং পাওনা দাবি করলে রাজনৈতিক প্রভাব বা পেশিশক্তি ব্যবহার করে মালিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ঘটনাও ঘটে। এ ছাড়া রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০-এ ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেনের বাধ্যবাধকতা [ধারা ১২(১)] থাকলেও তদারকি এড়ানো ও কর ফাঁকির উদ্দেশ্যে নগদ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। ফলে পরবর্তী সময়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে ভূমি মালিকেরা আইনি প্রতিকার ও প্রশাসনিক সুরক্ষা পেতে জটিলতার মুখে পড়েন।

মধ্যস্বত্বভোগীর মাধ্যমে অনিয়ম: জমি সংগ্রহ, প্রকল্প বাস্তবায়ন, সরকারি অনুমোদন ও প্লট বিক্রির বিভিন্ন পর্যায়ে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো মধ্যস্বত্বভোগী বা দালালদের মাধ্যমে অনিয়ম ও দুর্নীতির নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, জনপ্রতিনিধি, আইনজীবী, সাংবাদিক, দলিল লেখক, পেশাদার দালাল, সরকারি কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের একাংশ এই নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকেন, যাদের মাধ্যমে জমি দখল ও কম মূল্যে ক্রয়, ভয়ভীতি প্রদর্শন, প্রশাসনিক প্রভাব বিস্তার, অনুমোদন ও ছাড়পত্র সংগ্রহ এবং প্লট বিক্রিতে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারের মতো অনিয়ম সংঘটিত হয়। ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে অনিয়ম বাস্তবায়নের জন্য রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো বড় অংকের অর্থ ব্যয় করে, যা মূলত 'কমিশন' বা 'উপঢৌকন' হিসেবে দেওয়া হয়। জমি ক্রয়ে কমিশন সর্বোচ্চ ৩% বা শতাংশপ্রতি ২,০০০-৫,০০০ টাকা, কাঠাপ্রতি ১০,০০০-১৫,০০০ টাকা এবং প্লট বিক্রিতে প্লটপ্রতি ৫০,০০০-১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়া উপহার, ভোজ, ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব ও অন্যান্য সুবিধার মাধ্যমেও মধ্যস্বত্বভোগীদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা হয়।

৭.৫.২ প্রকল্প পরিকল্পনা ও অনুমোদন

বিভিন্ন আইনি শর্ত পালনে অনিয়ম: কোনো কোনো রিয়েল এস্টেট কোম্পানি রাজউকসহ সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার বৈধ অনুমোদন ও ছাড়পত্র ছাড়া অথবা পুরোনো তারিখে ও বিধিবহির্ভূতভাবে অনুমোদন নিয়ে আবাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্লট বিক্রি করে। এ ক্ষেত্রে রাজউকের সিল-প্যাড জাল করে তৈরি ভুয়া অনুমোদনপত্র ও লে-আউট প্রদর্শন এবং কোম্পানির নিবন্ধন নম্বরকে প্রকল্পের নিবন্ধন নম্বর হিসেবে উপস্থাপনের অভিযোগ রয়েছে। পরিবেশগত শর্ত ও অনুমোদিত পরিকল্পনা উপেক্ষা করে প্রকল্পের সীমানা বাড়ানো, নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল না করা, এবং প্রকল্প শেষে বিধি অনুযায়ী রাজউকের কাছে হস্তান্তর না করার অভিযোগ রয়েছে। একইভাবে, ইআইএ ও টিআইএর বাধ্যবাধকতা থাকলেও কৃত্রিম পরামর্শ সভা ও লোক-দেখানো ছবি ব্যবহার করে স্থানীয় জনগণের মতামত উপেক্ষা করা, পছন্দসই পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে তথ্য গোপন করা, এবং একই প্রতিবেদন একাধিক প্রকল্পে পুনর্ব্যবহার করার মতো অনিয়ম লক্ষ করা যায়।

৭.৫.৩ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন

কমিউনিটি সুবিধা উপেক্ষা: অনেক রিয়েল এস্টেট কোম্পানি প্রকল্প বাস্তবায়নকালে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ লঙ্ঘন করে লে-আউট প্ল্যানে প্রদর্শিত খেলার মাঠ, পার্ক, বিদ্যালয় ও সামাজিক অবকাঠামোর জায়গা বাণিজ্যিক প্লট হিসেবে বিক্রি করে দেয়। এছাড়া জনসংখ্যার অনুপাতে প্রয়োজনীয় রাস্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় স্থাপনার মতো বিষয়ে পরিকল্পনার মানদণ্ড অনুসরণ করা হয় না। আইনি বাধ্যবাধকতা এড়াতে কোনো কোনো কোম্পানি ৫ বা ১০ একরের বড় প্রকল্পকে কৃত্রিমভাবে একাধিক ছোট অংশে ভাগ করে দেখায়, যাতে বড় প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য কমিউনিটি সুবিধা দেওয়ার শর্ত এড়ানো যায়। এছাড়া আইন অনুযায়ী যেসব নাগরিক সুবিধা বিনামূল্যে পাওয়ার কথা, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ বা ব্যবহারের অজুহাতে ক্রেতাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ বা ফি আদায় করা হয়।

নির্মাণ/উন্নয়ন এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে অনিয়ম: কোনো কোনো রিয়েল এস্টেট কোম্পানি রাজউকের অনুমোদিত নকশা ও পরিবেশগত শর্ত উপেক্ষা করে বেআইনিভাবে নির্ধারিত সীমানার চেয়ে বহুগুণ বেশি জমি ভরাট করে। প্রকল্প চলাকালে মূল নকশা পরিবর্তন করে রাস্তা, নালা ও উন্মুক্ত স্থানের মতো নাগরিক সুবিধার আয়তন কমিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া নির্মাণস্থলে শ্রমিকের নিরাপত্তাসামগ্রী ও প্রশিক্ষণের অভাবে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে, এবং অপরিকল্পিত পাইলিং, ধুলোবালি ও শব্দদূষণের ফলে আশপাশের অধিবাসীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।

৭.৫.৪ প্লট বিক্রয় ও গ্রাহক ব্যবস্থাপনা

প্লট বিক্রয় ও বরাদ্দ সংক্রান্ত অনিয়ম: কোনো কোনো কোম্পানি রাজউকসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই ভুয়া নিবন্ধন নম্বর, জাল দলিল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ব্যবহার করে প্লট বিক্রি করে। এছাড়া ব্যক্তিগত, পারিবারিক, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বা অন্যের জমিতে বার্ষিক ১০-২০ হাজার টাকার চুক্তিতে সাইনবোর্ড স্থাপন করে সেগুলোকে প্রকল্পের জমি হিসেবে প্রচার এবং প্রকৃত মালিকানা বা অধিগ্রহণ নিশ্চিত হওয়ার আগেই প্লট বিক্রি করে। একই প্লট একাধিক ক্রেতার কাছে বিক্রি, চুক্তি অনুযায়ী উন্নত মানের প্লট না দিয়ে নিম্নমানের প্লট গ্রহণে বাধ্য করা, এবং সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্যায্য সুবিধা দিতে সাধারণ ক্রেতাদের বৈধ বরাদ্দ বাতিল বা পরিবর্তনের অভিযোগও রয়েছে।

প্লটের মালিকানা হস্তান্তর ও মূল্য পরিশোধে অনিয়ম: অনেক কোম্পানি প্লট ক্রয়ের পর মালিকানা হস্তান্তর, পুনঃবিক্রয় ও অর্থ পরিশোধে নানা অনিয়মের মাধ্যমে ক্রেতাদের অধিকার ও আর্থিক নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন করে। চুক্তি অনুযায়ী কিস্তি পরিশোধের পরও জমি বা দলিল হস্তান্তরে অযৌক্তিক বিলম্ব, অন্যায্য 'অনুমতিপত্র' (Permission Letter) চাপিয়ে পুনঃবিক্রয়ের স্বাধীনতা সীমিত এবং কিস্তি গ্রহণে কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি করে ক্রেতাকে খেলাপি দেখিয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় বা বরাদ্দ বাতিলের অভিযোগ রয়েছে। বরাদ্দ বাতিল বা চুক্তি পূরণে ব্যর্থতার পর জমাকৃত অর্থ ফেরত দেওয়ার সময় বিপুল পরিমাণে কর্তন, দীর্ঘসূত্রতা ও হয়রানি করা হয়। ক্রেতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের নামে চুক্তি হস্তান্তরেও আর্থিক হয়রানির অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ লঙ্ঘন করে ব্যাংকিং মাধ্যমের পরিবর্তে নগদ লেনদেন ও মানি রিসিট সংরক্ষণে অনিয়মের ফলে কর ফাঁকি এবং বিরোধের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের প্রমাণসংকট ও আইনি ঝুঁকি বাড়ে।

প্লট ক্রেতার কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়: অনেকসময় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর প্লটের মূল্য বাড়িয়ে প্লট ক্রেতার কাছে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা হয় এবং না দিলে প্লট হস্তান্তর না করার হুমকি দেওয়া হয়। গবেষণায় দেখা যায়, উন্নয়ন ফি, সার্ভিস চার্জ, ইউটিলিটি চার্জ ইত্যাদি বাবদ বিভিন্ন খাতে প্লট হস্তান্তর পর্যন্ত একজন ক্রেতাকে প্রতি কাঠায় মোট মূল্যের বাইরে প্রায় ১৪.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে হয়, যা আধুনিক ও বিলাসবহুল আবাসন প্রকল্পের ক্ষেত্রে বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। তবে প্লটের আকার বৃদ্ধির সঙ্গে এই ব্যয় একই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না; কারণ কিছু ব্যয় প্লটপ্রতি নির্ধারিত, আবার কিছু ব্যয় প্লটের আয়তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়।

কোম্পানিগুলো চটকদার বিজ্ঞাপনে কেবল প্লটের মূল দাম দেখিয়ে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করে; চুক্তিতে এসব অতিরিক্ত খাতের কথা উল্লেখ না করে অস্পষ্টভাবে 'প্রযোজ্য ক্ষেত্রে' লিখে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে ক্রেতাদের ওপর এই অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা চাপিয়ে

দেওয়া হয়। এমনকি নিজ জমিতে বাড়ি নির্মাণ শুরু করতে গেলেও কোম্পানিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অবৈধ চার্জ না দিলে কাজে সরাসরি বাধা সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া "মালিকানা হস্তান্তর ফি বা ট্রান্সফার ফি" আদায়ের পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারীদের কাছ থেকে প্রতি মাসে বাধ্যতামূলক "মাসিক সার্ভিস চার্জ" আদায় করা হয়। এই অযৌক্তিক ফি পরিশোধ না করলে অধিবাসীদের যাতায়াত, পণ্য পরিবহন ও দৈনন্দিন নাগরিক সেবায় কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি করা হয়।

সরাণি ২: গ্রাহকদের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত ব্যয়ের খাত ও আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ

প্লট ক্রয় ও প্লটের মালিকানা বুঝে পাওয়া পর্যন্ত ক্রেতার অতিরিক্ত ব্যয়ের খাতসমূহ			
অতিরিক্ত ব্যয়ের খাত	**অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ (টাকা)**		**পরিশোধের ধরন**
১. উন্নয়ন ফি/সার্ভিস চার্জ	কাঠাপ্রতি	২৫ হাজার - ৫ লক্ষ	এককালীন
২. বিদ্যুৎ সংযোগ নির্মাণ ও খুঁটি স্থাপন	কাঠাপ্রতি	৪ হাজার - ১০ হাজার	এককালীন
৩. ইউটিলিটি ডিপোজিট	প্লটপ্রতি	১ লক্ষ - ২.৫০ লক্ষ	এককালীন
৪. পানির লাইন সংযোগ ও প্রসেসিং ফি	প্লটপ্রতি	৩০ হাজার - ১.৫০ লক্ষ	এককালীন
৫. রোড কাটিং ও পাইপ ফিটিং চার্জ	প্লটপ্রতি	৫ হাজার - ২০ হাজার	এককালীন
৬. প্লটের সীমনা প্রাচীর ও অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাট নির্মাণ চার্জ	প্লটপ্রতি	৪ লক্ষ - ৫ লক্ষ	এককালীন
৭. ড্রেইন, কালভার্ট নির্মাণ ও সংযোগ ফি	প্লটপ্রতি	১.২০ লক্ষ - ১.৫০ লক্ষ	এককালীন
৮. পজেশন হ্যান্ডওভার ও অবস্থান হস্তান্তর ফি	প্লটপ্রতি	২০ হাজার - ৫০ হাজার	এককালীন
৯. নামজারি ও মিউটেশন প্রসেসিং ফি	প্লটপ্রতি	৩০ হাজার - ৮০ হাজার	এককালীন
প্লট ক্রয় পরবর্তী প্লটক্রেতার অন্যান্য অতিরিক্ত ব্যয়ের খাতসমূহ			
অতিরিক্ত ব্যয়ের খাত	**অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ (টাকা)**		**পরিশোধের ধরন**
১০. অবকাঠামো নির্মাণ অনুমতি/ ডেভেলপমেন্ট পারমিশন ফি • সংশ্লিষ্ট ডেভেলপার দিয়ে	কাঠাপ্রতি	২ লক্ষ - ১০ লক্ষ	এককালীন
• প্লট ক্রেতা নিজে	কাঠাপ্রতি	৫০ হাজার - ১.৫০ লক্ষ	
১১. মালিকানা হস্তান্তর ফি/ট্রান্সফার ফি	কাঠাপ্রতি	২৫ হাজার - ১০ লক্ষ	প্রতিবার
১২. সার্ভিস চার্জ (প্লট বিক্রয়)	কাঠাপ্রতি	২৫ হাজার - ৫০ হাজার	প্রতিবার
১৩. অন্য কোনো রিয়েল এস্টেট কোম্পানি/ব্যক্তিমালিকের থেকে প্লট ক্রয়ে	কাঠাপ্রতি	৫ লক্ষ - ১০ লক্ষ	প্রতিবার
১৪. প্রকল্প এলাকায় বসবাসের জন্য মাসিক ট্যাক্স • নিজস্ব ফ্ল্যাটে থাকলে	বর্গফুট প্রতি	০.৬ - ১	প্রতি মাসে
• ফ্ল্যাট ভাড়া দিলে	বর্গফুট প্রতি	০.৮ - ১.৫০	প্রতি মাসে

প্রকল্প এলাকায় পণ্য ও সেবা ক্রয়ে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ: গ্রাহকদের জিম্মি করে আবাসন প্রকল্প এলাকায় রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর একচেটিয়া ব্যবসা পরিচালনার প্রবণতা দেখা যায়। বসবাসকারী ও বাড়ি নির্মাণকারী মালিকদের কোম্পানির নিজস্ব ব্র্যান্ডের পণ্য (যেমন এলপিজি, ইন্টারনেট, কেবল টিভি সংযোগ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী) ক্রয়ে বাধ্য করা হয়। এমনকি বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে ইট, সিমেন্ট, রেডিমিক্স কংক্রিট, স্যানিটারি ও প্লাম্বিং সামগ্রী বাজারদরের চেয়ে ১০% থেকে ২০% বেশি দামে কেবল কোম্পানির অনুমোদিত ভেন্ডার থেকে কিনতে হয়। অনেক প্রকল্পে মাটি পরীক্ষা ও স্থাপত্য নকশার কাজও কোম্পানির নির্ধারিত নির্দিষ্ট ফার্ম থেকে করানো বাধ্যতামূলক, যার খরচ বাজারদরের চেয়ে ২০% থেকে ৫০% পর্যন্ত বেশি ধরা হয়। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় বাসা ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকেও নিয়মবহির্ভূতভাবে 'ভাড়াটিয়া নিবন্ধন ফি' আদায় করা হয়।

প্লটের মূল্য বৃদ্ধি এবং অন্যান্য অজুহাতে অতিরিক্ত অর্থ দাবি: প্লট বরাদ্দের পর চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে প্রকল্পের উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি, রেজিস্ট্রেশন খরচ, মামলা পরিচালনা ও প্রশাসনিক ব্যয়ের অজুহাতে কোনো কোনো রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ক্রেতাদের কাছে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করে। এসব খরচের হিসাবের ভিত্তি বা ব্যয়ের বিবরণ সম্পর্কে ক্রেতাদের কোনো সুস্পষ্ট তথ্য প্রদান করা হয় না। দাবি করা অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধে অস্বীকৃতি জানালে কৃত্রিম জটিলতা সৃষ্টি, হস্তান্তরে বাধা প্রদান কিংবা বরাদ্দ বাতিলের হুমকি দিয়ে ক্রেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়।

৭.৫.৫ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি

রিয়েল এস্টেট কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে অনিয়ম: রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোতে করপোরেট সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা চেয়ারম্যান নিয়োগে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাব এবং সাধারণ সভার সম্মতি উপেক্ষা করে পরিবারকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়। কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর ধারা ১৩০ এবং করপোরেট গভর্ন্যান্সের নির্দেশনা উপেক্ষা করে পরিচালনা পর্ষদে স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ না দেওয়ার ফলে আর্থিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে নিরপেক্ষ তদারকি ও পর্যালোচনার সুযোগ সীমিত থাকে। নেতৃত্বের অস্বচ্ছতা, পারিবারিক

আধিপত্য এবং স্বাধীন জবাবদিহির অভাব কোম্পানিগুলোতে অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি বাড়ায়, যার নেতিবাচক প্রভাব শেষ পর্যন্ত সাধারণ ক্রেতাদের স্বার্থ ও অধিকারের ওপর পড়ে।

রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ও সরকারি সংস্থার মধ্যে নিয়মবহির্ভূত লেনদেন: রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও ছাড়পত্র পেতে বিভিন্ন সরকারি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। কোম্পানিগুলোর ভাষায় একে "স্পিড মানি" বলা হয় এবং প্রকল্পের বাজেটে সাধারণত "বিবিধ খরচ" (Miscellaneous Costs) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে ফাইল দ্রুত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য "টেবিল খরচ", এবং সভা আয়োজনের জন্য "মিটিং খরচ"-এর নামে অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। নিয়ম মেনে আবেদন জমা দেওয়ার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে প্রক্রিয়া বিলম্বিত করে আবেদনকারীদের অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগে বাধ্য করা এবং "বিশেষ ক্ষেত্রে" (যেমন অনুমোদন প্রক্রিয়া জটিল, বৃহৎ প্রকল্প এলাকা ও অতিরিক্ত মুনাফা লাভের সম্ভাবনা, মাস্টার প্ল্যানে বড় কোনো পরিবর্তন/ড্যাপ/স্ট্রাকচারাল প্ল্যান বহির্ভূত প্রকল্প, কঠোর নিয়ন্ত্রণ, নীতিগত বাধা, আইনি ঝুঁকি, প্রকল্পের সংবেদনশীল ও কৌশলগত অবস্থান, দুর্নীতি বিরোধী অভিযান চলাকালীন অবস্থা) অনুমোদনের জন্য অতিরিক্ত অর্থ দাবি করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

সারণি ৩: বেসরকারি আবাসন খাত সংশ্লিষ্ট সরকারি ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন

ব্যয়ের মানদণ্ড	উদ্দেশ্য বা পর্যায়	নিয়মবহির্ভূত লেনদেনের পরিমাণ (টাকা)	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান	ব্যয়ের দায়ভার	পরিশোধের ধরন
ক. প্রকল্পভিত্তিক	১. জমির শ্রেণি/মৌজা পরিবর্তন	৫০ হাজার - ১ লক্ষ	উপজেলা/জেলা ভূমি অফিস	কোম্পানি	প্রয়োজন অনুযায়ী
	২. জমির নামজারি (মিউটেশন)	১০ হাজার - ২০ হাজার	এসি ল্যান্ড অফিস	কোম্পানি	এককালীন
	৩. আবাসিক প্রকল্পের লে-আউট/প্রকল্পের অনুমোদন	১০ লক্ষ - ২ কোটি	রাজউক	কোম্পানি	এককালীন
	৪. অনিবন্ধিত প্রকল্পের বিরুদ্ধে আইন ব্যবস্থা এড়ানো এবং পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ (ইন্সপেক্টরকে প্রদত্ত)	৩০ লক্ষ - ৪০ লক্ষ	রাজউক	কোম্পানি	প্রয়োজন অনুযায়ী
	৫. ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র	৩০ লক্ষ - ১ কোটি	রাজউক	কোম্পানি	এককালীন
	৬. জমির মালিকানা পরিবর্তন (কোম্পানি-প্লট ক্রেতা)	৫ লক্ষ - ১০ লক্ষ	রাজউক	কোম্পানি	প্রয়োজন অনুযায়ী
	৭. রিয়েল এস্টেট কোম্পানির নিবন্ধন প্রাপ্তি	১ লক্ষ - ১.৫০ লক্ষ	রাজউক	কোম্পানি	এককালীন
	৮. বিদ্যুতের সংযোগ ও গ্রিড সাবস্টেশন স্থাপন	১০ লক্ষ - ৫০ লক্ষ	ডিপিডিসি/ডেসকো	ব্যক্তি/কোম্পানি	এককালীন
	৯. অভ্যন্তরীণ (অঞ্চলভিত্তিক) পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং অন্যান্য লাইন তৈরি	৫০ লক্ষ - ১ কোটি	ঢাকা ওয়াসা	কোম্পানি	পর্যায়ক্রমিক ভিত্তিতে
	১০. ডিপ টিউবওয়েল বা গভীর নলকূপ স্থাপন	১ কোটি - ১.২০ কোটি	ঢাকা ওয়াসা	কোম্পানি	এককালীন
খ. একপ্রতি	১১. প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্র	১ লক্ষ - ১.৫০ লক্ষ	পরিবেশ অধিদপ্তর	কোম্পানি	এককালীন
	১২. পরিবেশগত ছাড়পত্র	৩ লক্ষ - ৬ লক্ষ	পরিবেশ অধিদপ্তর	কোম্পানি	এককালীন
	১৩. ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র/টিআইএ অনুমোদন	৩ লক্ষ - ৫ লক্ষ	ডিটিসিএ	কোম্পানি	এককালীন
একটি ২৫ একর আয়তনের আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়মবহির্ভূত ব্যয়ের পরিমাণ (ক+খ)			**৪.১১৬ কোটি – ৯.৩৫২ কোটি টাকা**		
একটি বেসরকারি আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে নিয়মবহির্ভূত ব্যয়ের পরিমাণ (একরপ্রতি)			**১৬.৫০ লক্ষ – ৩৭.৫০ লক্ষ টাকা**		

গবেষণায় দেখা যায়, বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের অনুমোদন, নামজারি, ছাড়পত্র ও ইউটিলিটি সংযোগের প্রতিটি ধাপে বিভিন্ন সরকারি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থায় (যেমন রাজউক, ভূমি অফিস, পরিবেশ অধিদপ্তর ও ওয়াসা) বিপুল পরিমাণ নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়। এর মধ্যে প্রকল্পের আওতাধীন ১০টি প্রকল্পভিত্তিক খাত এবং সরাসরি একরপ্রতি নির্ধারিত ৩টি ছাড়পত্র ও অনুমোদন সংক্রান্ত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ লেনদেন এককালীন হলেও কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী বা পর্যায়ক্রমে অর্থ পরিশোধ করা হয়। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে একটি বেসরকারি আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ায় একরপ্রতি সামগ্রিক নিয়মবহির্ভূত ব্যয়ের প্রাক্কলিত পরিমাণ ১৬.৫০ লক্ষ থেকে ৩৭.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। উদাহরণস্বরূপ, ২৫ একরের একটি বেসরকারি আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে এ ধরনের ব্যয়ের পরিমাণ আনুমানিক ৪.১২ কোটি থেকে ৯.৩৫ কোটি টাকা পর্যন্ত।

সংবাদমাধ্যমের কৌশলগত ব্যবহার: কোনো কোনো রিয়েল এস্টেট কোম্পানি অনিয়ম ও দুর্নীতি আড়াল করা এবং ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষায় গণমাধ্যমের মালিকানা ও প্রভাব ব্যবহার করে 'মিডিয়া ক্যাপচার'-এর কৌশল গ্রহণ করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এর মাধ্যমে ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রচার, বিতর্কিত কার্যক্রম আড়াল, নিয়ন্ত্রক সংস্থার ওপর পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রচারণার সুযোগ তৈরি হয়। গবেষণায় স্বার্থবিরোধী সংবাদ প্রকাশে বাধা, প্রতিবেদন প্রত্যাহারে চাপ, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে

মানহানির মামলা, ভয়ভীতি ও শারীরিক হামলা, চাকরিচ্যুতির চাপ এবং অর্থ বা প্লটের মাধ্যমে অনৈতিক সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ উঠে এসেছে।

রাজনৈতিক প্রভাব, পৃষ্ঠপোষকতা ও ব্যবসায়িক স্বার্থের যোগসূত্র: বেসরকারি আবাসন খাতের অনিয়ম, জবরদখল ও আইনি লঙ্ঘন টিকিয়ে রাখতে রাজনৈতিক প্রভাব, পৃষ্ঠপোষকতা এবং ব্যবসায়িক স্বার্থের শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে। রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো রাজনৈতিক অর্থায়ন ও নির্বাচনের সময় চাঁদা বা লজিস্টিক সহায়তার মাধ্যমে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অনৈতিক সুবিধা হাসিল করে। রাজউক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়াই কৃষিজমি, জলাশয় ও খাসজমি দখল এবং নীতিনির্ধারণী ক্ষমতার অপব্যবহার করে সরকারি জমি বেসরকারি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ছাড়া রাজনীতিবিদদের পরিচালনা পর্ষদে রাখা কিংবা মালিকদের রাজনৈতিক পদ গ্রহণের মাধ্যমে প্রশাসনিক সুরক্ষা আদায় করা হয়, যা রাজউকের স্বাধীন তদারকিকে পঙ্গু করে নগর সুশাসন ও জনস্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

বেসরকারি আবাসন খাতে দুর্নীতির চূড়ান্ত ভুক্তভোগী গ্রাহক: বেসরকারি আবাসন খাতে সরকারি সংস্থা, মধ্যস্বত্বভোগী ও রিয়েল এস্টেট কোম্পানির অনিয়ম ও নিয়মবহির্ভূত লেনদেনের চূড়ান্ত বোঝা বহন করেন সাধারণ গ্রাহক। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে একটি বেসরকারি আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ায় একরপ্রতি সামগ্রিক নিয়মবহির্ভূত ব্যয়ের গড় পরিমাণ দাঁড়ায় সর্বনিম্ন ১৬.৫০ লক্ষ থেকে ৩৭.৫০ লক্ষ টাকা, যা অননুমোদিত প্রকল্পের ছাড়পত্র আদায়, তদারকি এড়ানো এবং খাসজমি দখলসহ বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে বাণিজ্যিক সুবিধা অর্জনের উদ্দেশ্যে কোম্পানিগুলোর একধরনের 'কৌশলগত বিনিয়োগ' (Strategic Investment) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এসব ব্যয় নিজেরা বহন না করে উন্নয়ন ফি ও ইউটিলিটি চার্জের নামে গ্রাহকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, যার পরিমাণ কাঠাপ্রতি প্রায় ১৪.৫০ লাখ টাকা বা তার বেশি। ফলে কোম্পানি, মধ্যস্বত্বভোগী ও সংশ্লিষ্ট সরকারি পক্ষের পারস্পরিক স্বার্থনির্ভর দুর্নীতির চক্র টিকে থাকে এবং গ্রাহকদের আর্থিক নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা ও ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। এ বাস্তবতায় রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো শুধু দুর্নীতির সুবিধাভোগী নয়, বরং এ ব্যবস্থার সক্রিয় অংশীদার ও চালিকাশক্তি হিসেবেও ভূমিকা রাখে।

৭.৫.৬ বেসরকারি আবাসন খাতে "মাফিয়াতন্ত্র" ও 'স্টেট ক্যাপচার'

বেসরকারি আবাসন খাতে সরকার (প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা), বৃহৎ রিয়েল এস্টেট কোম্পানি এবং রাজনৈতিক শক্তির আঁতাতের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ত্রিমাত্রিক ক্ষমতা কাঠামো বা প্রাতিষ্ঠানিক "মাফিয়াতন্ত্র" গড়ে উঠেছে (চিত্র ১)।

চিত্র ১: বেসরকারি আবাসন খাতে 'মাফিয়াতন্ত্র'



এই ত্রিভুজাকার সম্পর্কের **প্রথম মাত্রায়**, রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো ঘুষ ও অবৈধ সুবিধার বিনিময়ে সরকারি সংস্থা থেকে নকশা অনুমোদন, পরিবেশগত ছাড়পত্র ও তদারকিহীন সুবিধা আদায় করে। **দ্বিতীয় মাত্রায়**, রাজনৈতিক অর্থায়নের বিনিময়ে রাজনৈতিক শক্তি কোম্পানিগুলোকে ভূমি দখল, আইনি পদক্ষেপ ও প্রশাসনিক সুরক্ষা দেয়। **তৃতীয় মাত্রায়**, রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে প্রশাসনিক নিয়োগ ও পদ-সুরক্ষার বিনিময়ে নীতি প্রণয়ন ও আইন প্রয়োগে রাজনৈতিক পক্ষপাত নিশ্চিত করা হয়।

সার্বিকভাবে, এই তিন পক্ষের সমন্বিত স্বার্থ, উদ্দেশ্য ও বহুমাত্রিক ক্ষমতাকাঠামো একসাথে মিলে বেসরকারি আবাসন খাতে একটি সুসংগঠিত "মাফিয়াতন্ত্র" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অভেদ্য নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মূল নিয়ন্ত্রণে রয়েছে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, তারপর সরকার বা প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং রাজনৈতিক শক্তি।

ড্যাপ সংশোধনে আবাসন ব্যবসায়ীদের প্রভাব: ড্যাপ সংশোধনের প্রতিটি পর্যায়ে আবাসন ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের প্রতিফলন দেখা যায়। ২০১০ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ১৫৮ বার ড্যাপ সংশোধন করে পার্ক, খেলার মাঠ, কৃষিজমি ও জলাশয়ে ভবন নির্মাণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। ২০২২-২০৩৫ ড্যাপ প্রকাশের মাত্র এক বছরের মধ্যে ব্যবসায়ীদের চাপে অন্তত চারবার সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং কারিগরি সুপারিশ ছাড়াই দুবার গেজেট প্রকাশিত হয়। রিহ্যাবের ধারাবাহিক চাপে ২০২৫ সালের অক্টোবরে ভবনের উচ্চতা ও ঘনত্ব দ্বিগুণ করার সুযোগ তৈরি করা হয়, যা রাজউক কর্মকর্তাদের বক্তব্যেও ডেভেলপারদের প্রভাব হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের তথ্যমতে, ড্যাপ পর্যালোচনা বৈঠকে

প্রায় ৭০% অংশগ্রহণকারী ছিলেন আবাসন ব্যবসায়ী, যেখানে সাধারণ নাগরিক, পরিকল্পনাবিদ ও পরিবেশবিদদের প্রতিনিধিত্ব ছিল নগণ্য। ফলে ব্যবসায়িক স্বার্থের কাছে বিশেষজ্ঞ মতামত ও জনস্বার্থ চরমভাবে উপেক্ষিত হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রক হিসেবে রাজউকের স্বাধীনতা ও পরিকল্পনা প্রণয়নের স্বচ্ছতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

অপ্রদর্শিত অর্থের সুরক্ষায় রিয়েল এস্টেট খাতের প্রভাব: বাংলাদেশের সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদের (অনুপার্জিত আয় প্রতিরোধ) পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও বেসরকারি আবাসন খাতে অপ্রদর্শিত অর্থ ('কালো টাকা') বিনা প্রশ্নে বিনিয়োগের সুযোগ আদায়ে রিহ্যাব ও রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক চাপ ও লবিইং চালিয়ে আসছে। প্রাক-বাজেট আলোচনায় বাজার চাঙ্গা রাখা, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব বৃদ্ধির অজুহাত দেখিয়ে তারা দীর্ঘমেয়াদে 'বিনাশর্তে উৎস-সুরক্ষার' দাবি জানায়। এই সুসংগঠিত দাবির চাপে সরকার বিভিন্ন অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে (যেমন ২০২০-২১ ও ২০২৪-২৫) আয়কর আইনে সুনির্দিষ্ট শিথিলতা এনে এনবিআরসহ যেকোনো তদন্তকারী সংস্থার প্রশ্ন তোলার এখতিয়ার রুদ্ধ করে "আইনি উৎস-সুরক্ষা" দিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে ২০২৫ ও ২০২৬ সালে এ সুবিধা বাতিল বা করহার বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হলে আবাসন বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যুক্তিতে প্রতিবাদের মাধ্যমে নীতিগত চাপ বজায় রাখা হয়।

আবাসন খাতে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির 'স্টেট ক্যাপচার': বেসরকারি আবাসন খাতে প্রভাবশালী রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর বহুমুখী ক্ষমতার প্রয়োগ থেকে শুরু করে চূড়ান্ত পর্যায়ে 'স্টেট ক্যাপচার' বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের একটি ধারাবাহিক ও কাঠামোগত প্রক্রিয়া চারটি পর্যায়ক্রমিক ধাপে কার্যকর হয় (চিত্র ২)।

চিত্র ২: আবাসন খাতে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির প্রভাব বিস্তার, নিয়ন্ত্রণ এবং 'স্টেট ক্যাপচার' প্রক্রিয়া

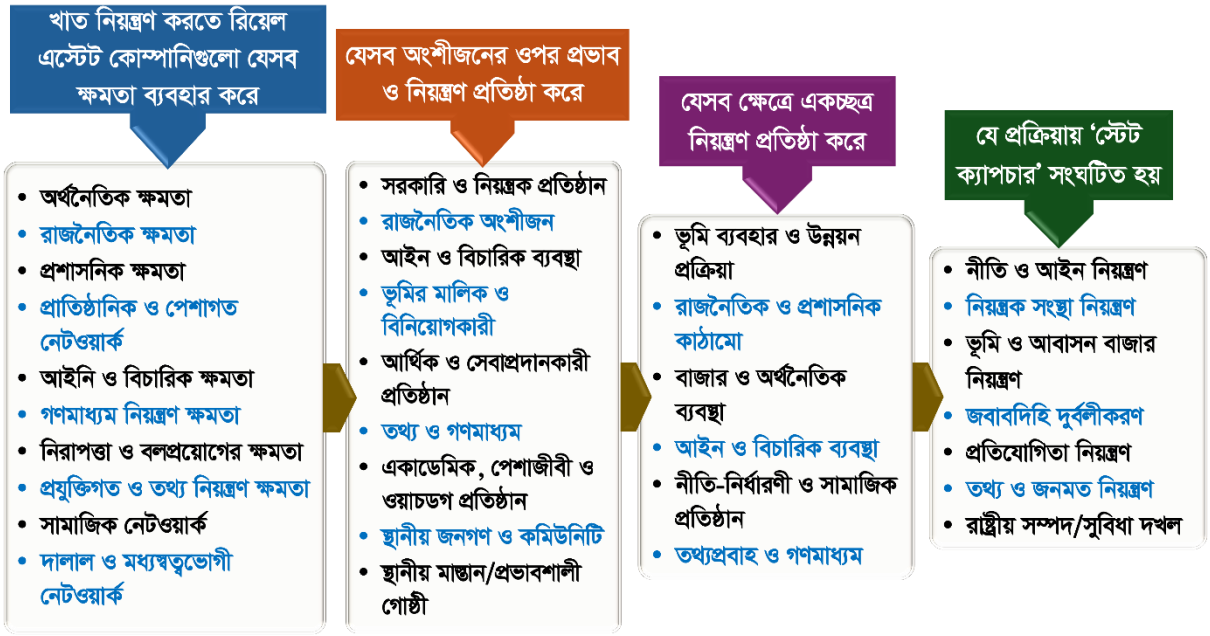

রিয়েল এস্টেট কোম্পানি দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক 'স্টেট ক্যাপচার' বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের একটি ধারাবাহিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় দেখা যায় – প্রথমত, তারা বহুমুখী ক্ষমতা প্রয়োগ করে খাতের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে; দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের নিজেদের স্বার্থের অনুগামী করে; তৃতীয়ত, ভূমি ব্যবহার, বাজার, আইন-বিচার, নীতিনির্ধারণ ও তথ্যপ্রবাহে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে; এবং চতুর্থত, এই নিয়ন্ত্রণ কাজে লাগিয়ে আইন ও নীতি পরিবর্তন, নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে নিষ্ক্রিয় করা, প্রতিযোগিতা ও জনমত নিয়ন্ত্রণ, জবাবদিহিতা দুর্বল করা এবং খাসজমি ও জলাশয় দখলের মাধ্যমে 'স্টেট ক্যাপচার' প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। ফলে আবাসন খাতের সংকট প্রাতিষ্ঠানিক ও বহুমাত্রিক ক্ষমতাকাঠামোয় রূপ নেয়, যেখানে ব্যবসায়িক সিন্ডিকেটের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সাধারণ ক্রেতাদের আর্থিক নিরাপত্তা ও অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই কাঠামোগত প্রক্রিয়ার ফলে বেসরকারি আবাসন খাতের সংকট কেবল প্রশাসনিক অনিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এক গভীর ও বহুস্তরীয় ক্ষমতা কাঠামোতে রূপ নিয়েছে, যা সাধারণ ক্রেতাদের শোষণ করার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সমান্তরালে পুরো খাতটির ওপর ব্যবসায়িক সিন্ডিকেটের দীর্ঘমেয়াদি ও একচ্ছত্র একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

৭.৬ জবাবদিহিতা

আইন প্রয়োগে ঘাটতি: নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর আইন প্রয়োগে শৈথিল্য ও কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অভাবে বেসরকারি আবাসন খাতে দায়মুক্তির সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল না করা, ড্যাপ লঙ্ঘন, অনুমোদিত নকশার বাইরে নির্মাণ ও জলাভূমি ভরাটের অভিযোগে বড় ডেভেলপারদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়নে নিষ্ক্রিয়তা,

জমি দখলের অভিযোগ এড়িয়ে যাওয়া, ক্রেতাদের অভিযোগ তদন্তে বিলম্ব এবং অনুমোদনহীন প্রকল্প ও বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় আইন প্রয়োগ ও প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা দুর্বল হচ্ছে এবং ক্রেতাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাত ও স্বার্থের সংঘাত: ইআইএ ও টিআইএ প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শকদের কার্যক্রমে তদারকি ও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে। ডেভেলপারদের স্বার্থে পক্ষপাতদুষ্ট বা ত্রুটিপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য গোপনের অভিযোগ থাকলেও সংশ্লিষ্টদের দায় নির্ধারণ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যকর প্রক্রিয়া নেই। এমনকি একটি শীর্ষস্থানীয় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরি দলের বিরুদ্ধে জলাভূমির তথ্য আড়াল করে পক্ষপাতদুষ্ট ইআইএ প্রতিবেদন তৈরি ও পরামর্শক ফি বণ্টনে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়। ফলে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে স্বার্থের সংঘাত ও পেশাগত অনিয়মের ঝুঁকি বজায় রয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারকি ব্যবস্থায় ঘাটতি: বেসরকারি আবাসন প্রকল্প অনুমোদনের পর নির্ধারিত নকশা, অনুমোদিত লে-আউট, উন্মুক্ত স্থান, সড়ক ও জলাধার সংক্রান্ত শর্তাবলী পরিপালন নিশ্চিতকরণে পর্যায়ক্রমিক ও কাঠামোবদ্ধ তদারকি ব্যবস্থার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে বাস্তবায়ন পর্যায়ে নকশার বিচ্যুতি কিংবা উন্মুক্ত স্থান সংকুচিত করার মতো গুরুতর অনিয়মগুলো দীর্ঘ সময় অশনাক্ত থেকে যায় এবং পরবর্তীতে আর সংশোধন করার মতো পর্যায়ে থাকে না। অন্যদিকে, নিবন্ধনহীন ও অবৈধ আবাসন প্রকল্প তদারকি, আইন প্রয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণে রাজউক ও জেলা প্রশাসনের মধ্যে উদাসীনতা, সক্ষমতার ঘাটতি ও জনবল সংকটের অজুহাতে দায়িত্ব এড়ানোর প্রবণতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

বিরোধ নিষ্পত্তি ও ভুক্তভোগী সুরক্ষায় জবাবদিহিতার ঘাটতি: বেসরকারি আবাসন খাতে কার্যকর ও নিরপেক্ষ বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার অভাবে গ্রাহক ও ভূমিমালিকেরা প্রতিকার পেতে নানা বাধার সম্মুখীন হন। অধিকাংশ রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে প্রাতিষ্ঠানিক অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা নেই; অন্যদিকে রাজউক ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা প্রতিকারপ্রাপ্তি কঠিন করে তোলে। পাশাপাশি রিহ্যাব ও বিএলডিএর বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে তদন্তের পরিবর্তে ডেভেলপারদের স্বার্থ রক্ষার অভিযোগ রয়েছে। গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করা, সেগুলোকে 'অপপ্রচার' হিসেবে উপস্থাপন করা, এবং অভিযুক্ত সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে দায়মুক্তির সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে, যার ফলে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

৮. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

বেসরকারি আবাসন খাতে সুশাসনের প্রায় সব সূচকেই কাঠামোগত দুর্বলতা ও বাস্তবায়নের ঘাটতি বিদ্যমান। বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার ফাঁকফোকর, শিথিল প্রয়োগ এবং সমন্বয়হীনতার সুযোগ নিয়ে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো ধারাবাহিকভাবে আইন লঙ্ঘন করে চলছে। অন্যদিকে নিয়ন্ত্রক সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন ও ইউটিলিটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা ও সদিচ্ছার অভাবে তৈরি হওয়া প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে প্রভাবশালী কোম্পানিগুলো আইনি বাধ্যবাধকতা এড়িয়ে যাচ্ছে। ভূমি নির্বাচন, ক্রয় ও দখল, প্রকল্প অনুমোদন থেকে শুরু করে প্লট হস্তান্তর পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে পদ্ধতিগত অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে, যেখানে অপপ্রচার, তথ্যপ্রবাহ রুদ্ধ করা, নাগরিক অংশগ্রহণকে সীমিত রাখা এবং দুর্বল বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে একধরনের আইনি দায়মুক্তির সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। তদুপরি, রাজনৈতিক ছত্রছায়া, মধ্যস্বত্বভোগী ও প্রশাসনিক অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের সহায়তায় বৃহৎ ডেভেলপাররা একটি শক্তিশালী 'মাফিয়াতন্ত্র' গড়ে তুলে নীতিনির্ধারণী ও সামগ্রিক নিয়ন্ত্রক কাঠামোকে কার্যত জিম্মি করে ফেলেছে। আবাসন খাতে কালো টাকা বিনিয়োগকে বৈধতা দেওয়ার ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ও তাদের সংগঠনগুলোর অব্যাহত প্রচেষ্টা এই খাতে সুশাসনকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। কোম্পানিগুলোর এই অতি-মুনাফাকেন্দ্রিক মানসিকতা এবং অনিয়ম-দুর্নীতির ফলে জমির মালিক ও সাধারণ ক্রেতারা আর্থিক ক্ষতির শিকার হচ্ছেন এবং তাঁদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। সার্বিকভাবে, এসব অনিয়ম ঢাকা শহরের পরিবেশগত সুরক্ষা ও স্থিতিশীলতা, পরিকল্পিত নগরায়ণ, 'সবার জন্য সাশ্রয়ী আবাসন' নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের পথে গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

৯. সুপারিশমালা

আইনগত ও নীতিনির্ধারণী

১. রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ -এ যেসব সংশোধন করতে হবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে – কোম্পানির নিবন্ধন নবায়নে পূর্ববর্তী কার্যক্রমের বাধ্যতামূলক মূল্যায়ন; সদস্যপদের জন্য একক ও আইনসম্মত কাঠামো প্রণয়ন; প্রকল্পের প্রসপেক্টাস ও বরাদ্দপত্রকে সমান আইনি গুরুত্ব প্রদান এবং চুক্তি লঙ্ঘন ও মিথ্যা প্রচারকে শাস্তিযোগ্য করা; ক্রেতার লিখিত সম্মতি ছাড়া প্লট বা ফ্ল্যাট পরিবর্তনের সুযোগ বাতিল; যুক্তিসংগত কারণ যাচাই ও শুনানির মাধ্যমে দলিল সম্পাদন; এবং বাজার একচেটিয়াকরণ ও কৃত্রিম সংকট রোধে একক কোম্পানির ভূমি অধিগ্রহণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা।

২. বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১২ ও ২০১৫)-এ যেসব সংশোধন করতে হবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে – জমি অধিগ্রহণে বাজারমূল্যের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সামগ্রিক জীবিকাহানি বিবেচনায় সমন্বিত পুনর্বাসন বাধ্যতামূলক করা; প্রকল্পের অবশিষ্ট ২৫% জমির মালিকদের জোরপূর্বক উচ্ছেদের পরিবর্তে অংশীদারিত্ব বা সমমূল্যের প্লট গ্রহণের সুযোগ দেওয়া; ক্রেতা সুরক্ষা, অন্তর্ভুক্তিমূলক নকশা (নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের প্রবেশগম্যতা) এবং সমন্বিত ইউটিলিটি সক্ষমতা যাচাইকে (IUCC) অনুমোদনের পূর্বশর্ত করা; রাজউক অনুমোদিত মানসম্মত ও ন্যায্য

চুক্তিপত্র (Standard Fair Contract) ব্যবহারে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা; এবং নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত পরীক্ষামূলক প্রকল্পের অনুমোদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিলের বিধান রাখা।

৩. সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধিতে যেসব পরিবর্তন প্রয়োজন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে – অবৈধ প্রকল্পকে শুধু জরিমানার মাধ্যমে বৈধ করার সুযোগ সীমিত বা বাতিল করে শর্তভঙ্গের ক্ষেত্রে কোম্পানির লাইসেন্স স্থগিত, প্রকল্প বাতিল ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান; জলাশয় বা কৃষিজমি ভরাটের ঘটনায় প্রকল্প বাতিল, দায়ী ডেভেলপারকে কালো তালিকাভুক্ত এবং পরিবেশ পুনরুদ্ধারের ব্যয় আদায়; অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নির অপব্যবহার রোধ, মালিকানা হস্তান্তর ও পূর্ণ নিবন্ধন ছাড়া প্লট বিক্রয় ও উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা; এবং প্লটের শ্রেণি, অবস্থান ও বাজারমূল্যের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণের স্বচ্ছ মানদণ্ড ও নিয়মিত বাজারমূল্য পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

৪. রাজউক, সিটি কর্পোরেশন, ইউটিলিটি সংস্থা, জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের (নগর পরিকল্পনাবিদ, পরিবেশবিদ) অন্তর্ভুক্ত করে একটি আন্তঃসংস্থা সমন্বয় প্ল্যাটফর্ম গঠন করতে হবে এবং তাৎক্ষণিক তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৫. পরিবেশগত মূল্যায়নের (ইআইএ) পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ ও ট্রাফিক মূল্যায়নের (টিআইএ) গাইডলাইন প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানির জন্য ইআইএ ও টিআইএ বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন মূল্যায়ন তালিকাভুক্ত বিশেষজ্ঞদের দিয়ে যাচাই নিশ্চিত করতে হবে।

৬. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে রাজউক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এবং জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে আবাসন বাজার তদারকির জন্য একটি সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি

৭. গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে রাজউক ও বেসরকারি আবাসন ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি 'স্বাধীন অভিযোগ নিষ্পত্তি বোর্ড' গঠন করতে হবে, এবং এ সংক্রান্ত সব তথ্য নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে।

৮. রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর বার্ষিক অডিট ও আর্থিক তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক করাসহ এমডি/চেয়ারম্যানের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ এবং বোর্ডে স্বাধীন পরিচালক ও অডিট কমিটি রাখা আবশ্যিক করতে হবে।

৯. বিজ্ঞাপনে প্লটমূল্যের পাশাপাশি উন্নয়ন ফি, ইউটিলিটি চার্জ ও রিফান্ড নীতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ বাধ্যতামূলক করতে হবে। পাশাপাশি ওয়েবসাইট ও বিজ্ঞাপনে প্রকল্প-সংক্রান্ত সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের বাধ্যতামূলক ও নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ

১০. বৈশ্বিক উত্তম চর্চার আলোকে এই খাতের জন্য সুনির্দিষ্ট নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

১১. বৈধ অনুমোদন ও ছাড়পত্র ছাড়া প্লটের বিজ্ঞাপন প্রচারে সংশ্লিষ্ট ডেভেলপার ও প্রচারমাধ্যমগুলোর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২. জমি অধিগ্রহণ, প্লট বিক্রয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল আর্থিক লেনদেন বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে এবং তা নিয়মিত নিরীক্ষার আওতায় আনতে হবে।

১৩. যেকোনো অবৈধ ভূমি/জলাশয় দখল, প্রকল্প ও ভূমি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রিয়েল এস্টেট কোম্পানির বিরুদ্ধে এবং একইসাথে এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সরকারি নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মী, রাজনৈতিক প্রভাবশালী, এবং অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

****